বছরের আলোচিত চরিত্র

র‍্যাব

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

'ব্যবসা প্রায় বন্ধ হওয়ার অবস্থা। নিজের নিরাপত্তা নেই। নিরাপত্তা নেই সন্তানদের। চাঁদা দিতে দিতে সর্বশান্ত হয়ে পড়েছি। পুলিশ এই চাঁদাবাজদের শেল্টারদাতা। তাই পুলিশের কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই। জীবন যখন দুর্বিষহ, তখন আল্লাহর আশীর্বাদ হয়ে এসেছে 'র‍্যাব'। এলাকা এখন সন্ত্রাসীমুক্ত। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে মারা গেছে এক সন্ত্রাসী। অন্যরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। চাঁদা দিতে হচ্ছে না শান্তিতে ব্যবসা করতে পারছি। র‍্যাবের 'ক্রসফায়ার'কে আমরা ১০০% সাপোর্ট করি।'

একটি স্যাটেলাইট চ্যানেলের সরাসরি সম্প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানের একজন দর্শকের টেলিফোন মন্তব্য। প্রায় একই রকম মন্তব্য করলেন আরো অনেক দর্শক। যারা সবাই সমর্থন করছেন র‍্যাবের কার্যক্রমকে। পাড়া-মহল্লা-অফিস যে কোনো স্থানের প্রধান আলোচনার বিষয় এখন র‍্যাব। সাধারণ জনগণ বলতে আমরা যাদের বুঝি তাদের প্রায় সবাই র‍্যাবের কার্যক্রমের সমর্থক। র‍্যাবের কার্যক্রম কী? পুলিশ যেসব সন্ত্রাসী ধরতে পারতো না এবং ধরতো না, তাদের ধরছে। পুলিশ এদের কাউকে কাউকে কখনো ধরলেও দুর্বলভাবে মামলা সাজিয়ে কোর্টে পাঠাতো। অল্প সময়ের মধ্যে তারা জামিন নিয়ে বের হয়ে এসে আবার সন্ত্রাসী কর্মকান্ড শুরু করতো। যার জন্যে এই ক্রসফায়ার। র‍্যাব এসব সন্ত্রাসী ধরে জেলে পাঠাচ্ছে না। চিরদিনের জন্যে বিদায় করে দিচ্ছে পৃথিবী থেকে। একের পর এক সন্ত্রাসী নিহত হচ্ছে ক্রসফায়ারে। আরো সরাসরি বললে বলা যায়, কোনো রকম বিচারের মুখোমুখি না করে হত্যা করা হচ্ছে। এবং দেশের মানুষ এটা অমানবিক হলেও সমর্থন করছে।

মাথায় কালো কাপড়, চোখে কালো চশমা, সর্বাঙ্গে কালো ভূষণ আর কারবাইন হাতে 'র‍্যাব' নামের বিশেষ বাহিনী এ বছরে আলোচনার প্রধান বিষয়। র‍্যাবের কর্মকান্ডে দেশের সন্ত্রাসী মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্ট হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংগঠনগুলোও এর কর্মকান্ডের পক্ষে-বিপক্ষে সোচ্চার। ক্ষমতাসীন জোট মনে করছে, সরকারের লুপ্ত জনপ্রিয়তাকে ফিরিয়ে এনেছে র‍্যাবের কার্যক্রম। র‍্যাবের সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান জনমনে শান্তি

ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। বিরোধী দলগুলো বলছে, জোট সরকার সন্ত্রাস দমনে তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে র‍্যাবের হাতে মানুষ হত্যার লাইসেন্স তুলে দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শুধু সংবিধান, আইন আর মানবাধিকারই লঙ্ঘন হচ্ছে না, র‍্যাবের রাজনৈতিক ব্যবহার দেশের মধ্যে এক ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করবে।

র‍্যাব তার যাত্রার শুরু থেকেই সংবাদ শিরোনামে থাকছে। র‍্যাবের বহুল আলোচিত 'ক্রসফায়ার' এখন দেশের মানুষের পরিচিত শব্দ। র‍্যাব কাউকে গ্রেপ্তার করলে ধরেই নেয়া হয় যে ঐ ব্যক্তি আর ফিরে আসবে না। রাস্তার ধারে, ধানক্ষেতে অথবা অন্য কোনো জায়গায় তার লাশ পাওয়া যাবে এবং সংবাদে বলা হবে যে ঐ ব্যক্তিকে তার সহযোগীরা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আক্রমণ করলে উভয় পক্ষের বন্দুকযুদ্ধের মধ্যে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। র‍্যাব নামের এই বিশেষ বাহিনী কার্যত দেশের সম্পাদকীয় বিভাগের বিবেচনায় এ বছরের আলোচিত চরিত্র 'র‍্যাব'।

'র‍্যাব' সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ বাহিনী 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন'-এর সংক্ষিপ্ত নাম। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের আগে সন্ত্রাস দমনের জন্য পুলিশের বিশেষ বাহিনী হিসেবে 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ট্রুপস' গঠন করা হয়। সেটা ছিল কেবল পুলিশের লোকদের নিয়ে গঠিত। কিন্তু পরবর্তীতে সরকারি কর্তৃপক্ষ সেটা যথেষ্ট মনে না করায় পুলিশ আইনের আওতায় কার্যত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের কর্তৃত্বাধীনে সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে এই 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' বা 'র‍্যাব' গঠন করা হয়। র‍্যাব ঢাকাকে চার ভাগে ভাগ করে নিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আগে তো বেঁচে থাকতে হবে, তারপর মানবাধিকার। যদি বেঁচেই না থাকি তাহলে কিসের মানবাধিকার? এ প্রশ্ন র‍্যাবের কার্যক্রম সমর্থন করা সব মানুষের, সাধারণ মানুষের

আইন ও বিচার ব্যবস্থার বাইরে একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা চালু করেছে। র‍্যাবের পক্ষে-বিপক্ষে অভিমত, আইন ও সাংবিধানিক অবস্থান, তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জনমত এবং সর্বোপরি র‍্যাবের ক্রসফায়ার কৌশল- এসব মিলিয়ে তাকে বছরের আলোচিত চরিত্রে পরিণত করেছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর একেক বিভাগের প্রতিটি ওয়ার্ডে বারোজন করে সোর্স নিয়োগ করেছে। এরা সবাই র‍্যাবে চাকরি করে। পুলিশের সোর্স মূলত পকেটমার, ছিনতাইকারী। র‍্যাব সেখানে নিজেদের লোক দিয়ে সোর্সের কাজ করছে। যার সুফলও পাচ্ছে তারা। পুলিশের সঙ্গে নানা কারণে র‍্যাবের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। কোথাও কোথাও র‍্যাব এবং পুলিশের সঙ্গে দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হচ্ছে। হবারই কথা। র‍্যাব পুলিশের মূল উপার্জনে হাত দিয়েছে।

সন্ত্রাস দমনে 'র‍্যাব' নামক এই বিশেষ বাহিনীর ধারণার সূত্রপাত 'অপারেশন ক্লিন হার্ট'-এর সময়ে। বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সন্ত্রাস দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও অতীত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের সিন্ডিকেটেড সন্ত্রাস জোট সরকারের আমলে আরো বৃদ্ধি পেয়ে গণসন্ত্রাসে রূপলাভ করে। ঐ সন্ত্রাস সম্পর্কে সরকারের উপেক্ষার মনোভাব, বিশেষ করে সে সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর উপহাসমূলক কথাবার্তা জনমনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সংবাদপত্রে প্রতিদিন সন্ত্রাসের খবর প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম হওয়ার কারণে জনমনে এক ধরনের চরম হতাশাবোধও তৈরি হয়। বিদেশী বিনিয়োগকারী দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহও সন্ত্রাস দমনের জন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এ অবস্থায় জোট সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সন্ত্রাস দমনে সারা দেশে সেনাবাহিনী নামায়। সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বাধীন পুলিশসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযান চলে দেশজুড়ে। এই অভিযানের নাম দেয়া হয় 'অপরেশন ক্লিন হার্ট'। কিন্তু অচিরেই ঐ সেনা অভিযান জোট সরকারের জন্য ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। সেনা অভিযানে ধৃত ব্যক্তিদের নির্যাতনে মৃত্যুর

'বিবেকের কাছে পরিষ্কার থেকে কাজ করছি'

কর্নেল চৌধুরী ফজলুল বারী
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, র‍্যাব

সাপ্তাহিক ২০০০ : র‍্যাবের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী?

কর্নেল চৌধুরী ফজলুল বারী : আমরা সমাজ থেকে সন্ত্রাস মুক্ত করতে চাই। আমাদেরকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ একটা দরিদ্র দেশ। সেই দরিদ্র দেশের জনগণের কষ্টের টাকায় আমরা বেতন পাই। মানুষ যাতে একটু শান্তিতে থাকতে পারে, নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে জীবনযাপন করতে পারে- সমাজে সে রকম একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য খুবই স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার। আমরা আমাদের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থেকে কাজ করছি।

২০০০ : কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে বা কোনো অপরাধীকে ধরে আইনের...

কর্নেল বারী : আমরা অপরাধী আইনের হাতে সোপর্দ করছি। সেটাই আমাদের করার কথা। অপরাধীর অস্ত্র, সঙ্গী-সাথীদের ধরাও আমাদের কাজ। আমাদের হাতে ধরা পড়ার পর জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধী যখন স্বীকার করছে অমুক জায়গায় অস্ত্র আছে, সন্ত্রাসী আছে- তখন তাকেসহ আমরা সেখানে অপারেশন করছি। অপরাধীরা যখন আমাদের ওপর আক্রমণ করছে তখন আমরাও গুলি করছি। অনেক সন্ত্রাসী এভাবে মারা গেছে। এভাবে 'ক্রসফায়ারে' সন্ত্রাসী মারা যেতেই পারে। তবে সবাই ক্রসফায়ারে মরছে না। অনেক ক্ষেত্রে এনকাউন্টারে মারা যাচ্ছে। সেটাকেও পত্রিকায় ক্রসফায়ার হিসেবে লেখা হচ্ছে।

২০০০ : ক্রসফায়ারের নামে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

কর্নেল বারী : এ ধরনের অভিযোগের কোনো অর্থ হয় না। আমরা কাউকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করছি না। দেশের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থেকে আমরা কাজ করছি। মানুষ র‍্যাবের কার্যক্রম সমর্থন করছে। অল্প সময়ের মধ্যে সমাজে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। যদিও কার্যক্রম শুরুর সময় আমদের অস্ত্র, পোশাক... প্রায় কিছুই ছিল না। এখন র‍্যাবের জন্যে অনেক আধুনিক ইকুইপমেন্টস এসেছে। অস্ত্র, পোশাক, অফিস সবই হয়েছে। জনগণের কষ্টের টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা হয়েছে। এর প্রতিদান আমাদের দিতেই হবে।

২০০০ : আপনারা সন্ত্রাসী চিহ্নিত করছেন কীভাবে?

কর্নেল বারী : কোনো পুরনো তালিকা নিচ্ছি না। আমরা সম্পূর্ণ নতুনভাবে সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করছি। পুরনো কোনো তথ্যকেই আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। সবকিছু নতুন করে শুরু করেছি।

২০০০ : এ ক্ষেত্রে আপনাদের সোর্স কারা? পুলিশের সোর্সই কী আপনাদের সোর্স?

কর্নেল বারী : না, পুলিশের সোর্সের মতো র‍্যাবের কোনো সোর্স নেই। র‍্যাবে যারা চাকরি করে তারাই র‍্যাবের সোর্স।

সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ পেতে থাকে। সেনা কর্তৃপক্ষ তখনকার 'ক্রসফায়ার'-এ মৃত্যুর মতো ঐ সব মৃত্যুকে 'হার্ট অ্যাটাকে' মৃত্যু বলে অভিহিত করতে থাকে। কিন্তু সেটা জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। অপারেশন ক্লিন হার্টে সন্ত্রাসীরা গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়ে। অপারেশন ক্লিন হার্টে সেনা হেফাজতে তথাকথিত 'হার্ট অ্যাটাকে' যাদের মৃত্যু ঘটেছে তাদের কেউই কোনো নামকরা সন্ত্রাসী ছিল না। এ অভিযানে সন্ত্রাসীরা পার পেয়ে গেলেও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা এর শিকার হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন বিএনপি জোটের নেতা-কর্মীরাই অপারেশন ক্লিন হার্টে ধরা পড়তে থাকে। এর ফলে সরকার কেবল বিরোধী দলই নয়, সরকারি দলের তরফ থেকেও অপারেশন ক্লিন হার্টের ব্যাপারে প্রচন্ড চাপ ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

সেনাবাহিনী নিয়োগ করে অপারেশন ক্লিন হার্টের কোনো আইনি বৈধতাও ছিল না। অপারেশন ক্লিন হার্টে নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের তরফ থেকে আদালতে নালিশি মামলা জারি হওয়া শুরু হলে সরকার এ পদক্ষেপ থেকে পিছিয়ে যায় এবং অপারেশন ক্লিন হার্টকে আইনি ছত্রছায়া দেয়ার জন্য সংসদে ইনডেমনিটি আইন পাস করে। এ ধরনের ইনডেমনিটি আইন জোট সরকারকে সমালোচনার মুখে ফেলে। তাছাড়া সন্ত্রাস দমনে অপারেশন ক্লিন হার্ট সে ধরনের বিশেষ কোনো তৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেনি।

এই অপারেশন ক্লিনহার্টের অভিজ্ঞতাই জোট সরকারকে সন্ত্রাস দমনের জন্য আইনের কাঠামোয় বিশেষ বাহিনী গঠন করতে উৎসাহিত করে। অপারেশন ক্লিন হার্ট চলার সময়ই সেনাবাহিনী দিয়ে পুলিশ বাহিনীর বাছাই করা সদস্যদের বিশেষ ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের ব্যাপারে পুলিশকে ট্রেনিং দেয়া হয়।

অপারেশন ক্লিন হার্টের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সেনাবাহিনীর এই ট্রেনিংপ্রাপ্তদের দিয়েই পুলিশের বিশেষ বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয় সে সময়ই। সরকার সন্ত্রাসীদের মোকাবেলার জন্য 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ট্রুপস' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের জন্য কার্যালয় পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সরকারের ঐ চিন্তা পরিবর্তন করে সেনাবাহিনীসহ পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর সহযোগে 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অধ্যাদেশে সংশোধন এনে তার অধীন গঠন করা হয় এই বিশেষ বাহিনী, 'র‍্যাব' নামে ইতিমধ্যে যা পরিচিতি পেয়েছে।

সন্ত্রাস দমনের জন্য র‍্যাব গঠন এবং তাদের সন্ত্রাস দমন কার্যক্রম সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও র‍্যাব কর্তৃক 'ক্রসফায়ার' কৌশলে হত্যাকান্ড র‍্যাবকে বিশেষ আলোচনার বিষয়ে পরিণত করেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, র‍্যাবের 'ক্রসফায়ার' কৌশল সম্পূর্ণভাবেই সংবিধান ও আইনের পরিপন্থী। সংবিধানের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারভাগে একজন নাগরিকের জীবনের ওপর অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, গ্রেপ্তার ও আটক থেকে তার রক্ষাকবচও নির্দিষ্ট করা আছে। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করলে তাকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করতে হবে এবং কেবল আদালতের নির্দেশেই তাকে পুলিশের হেফাজতে রাখা যাবে। শুধু তাই নয়, পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে কারও মৃত্যু হলে তার দায়ও ঐ কর্তৃপক্ষকে বহন করার আইন আছে। এ কারণেই অপারেশন ক্লিন হার্টের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর ঘটনাবলীকে ইনডেমনিটি আইনে আইন ও বিচারের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনো ইনডেমনটি

এ ধারা অব্যাহত থাকলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ইউনুসের মতো ভাগ্য বরণ করে নিতে হবে আমাদের প্রগতিশীল লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষকদের। মনে রাখতে হবে, যারা বিএনপি হিসেবে পরিচিত তারাও রেহাই পাবে না জামায়াত-শিবিরের ভয়াল থাবা থেকে

২০০০ : আর একটু পরিষ্কার করে বলবেন?

কর্নেল বারী : আমরা সমগ্র ঢাকাকে আমাদের সুবিধামতো চার ভাগে ভাগ করেছি। প্রতি ভাগের প্রতিটি ওয়ার্ডে বারোজন করে সোর্স নিয়োগ করেছি। এরা বিভিন্নভাবে এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যারা সবাই র‍্যাবে চাকরি করে। তাই তথ্যের জন্যে আমাদের অন্য কারো ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। আমরা সোর্সের কাছ থেকে যে তথ্য পাচ্ছি সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছি। সন্ত্রাসীর প্রোফাইল তৈরি করছি। মামলার কাগজপত্র জোগাড় করছি। তারপর অপারেশনে যাচ্ছি। আমরা অনেক সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে কাজ করছি।

২০০০ : অপারেশন ক্লিন হার্ট যখন চলে তখনও সন্ত্রাস কমে গিয়েছিল। তারপর আবার সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল। র‍্যাবের অপারেশন বন্ধ হওয়ার পর আবার তো সন্ত্রাস শুরু হবে।

কর্নেল বারী : অপারেশন ক্লিন হার্টের সঙ্গে র‍্যাবের কার্যক্রম মিলালে চলবে না। র‍্যাব গঠন করা হয়েছে একটি নিয়মিত বাহিনী হিসেবে। অনেকটা পুলিশের মতোই। র‍্যাবের কার্যক্রম হঠাৎ করে বন্ধ হবে না।

২০০০ : পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের সখ্য, লেনদেনের সম্পর্ক অনেকটা ওপেন সিক্রেট। র‍্যাব স্থায়ী বাহিনী হলে র‍্যাবের অবস্থাও যে পুলিশের মতো হবে না এর নিশ্চয়তা কী?

কর্নেল বারী : র‍্যাবের অবস্থা পুলিশের মতো হবে না। হওয়ার সুযোগ নেই। বিভিন্ন বাহিনী থেকে বাছাই করে আনা হচ্ছে র‍্যাবে। আমি সেনাবাহিনীতে চাকরি করি। বিডিআরে চাকরি করেছি। এখন র‍্যাবে এসেছি। আমার মতো যারাই র‍্যাবে আসবে, মেয়াদ হবে এক-দুই বছর। আমার বিশ্বাস, সবাই এই সময়টাতে তার কেরিয়ার আরো উজ্জ্বল করতে চাইবে। দেশের জন্য, মানুষের জন্য সরাসরি কিছু করতে পারার এই সুযোগটা সবাই কাজে লাগাতে চাইবে। তা না হলে সে ব্যর্থ হিসেবে পরিচিতি পাবে। এখানে যে ব্যর্থ হবে তার কেরিয়ারে একটা বাজে প্রভাব পড়বে। এটা কেউই চাইবে না।

২০০০ : র‍্যাবের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ, জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা ক্রসফায়ারের স্বীকার হচ্ছে না।

কর্নেল বারী : আমরা দলীয় পরিচিতি দেখছি না। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। যেখানে আমরা আক্রমণের শিকার হচ্ছি, সেখানেই প্রতিরোধ করছি। গুলিবিনিময়ে কোনো কোনো সন্ত্রাসী নিহত হচ্ছে। যারা র‍্যাবের ওপর আক্রমণ করছে না, তারা নিহত হচ্ছে না।

২০০০ : চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী আহমইদ্যা ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে। সে জামায়াত থেকে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিল। ভাগিনা রমজানের মতো কুখ্যাত জামায়াত সন্ত্রাসী নিহত হয়নি। এ সমস্ত কারণেই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে...

কর্নেল বারী : সবাইকেই আমরা আইনের হাতে সোপর্দ করতে চাই। যারা পালাতে চাইছে না, যাদের সন্ত্রাসী বাহিনী র‍্যাবের ওপর আক্রমণ করছে না, তাদের তো নিহত হওয়ার প্রশ্ন আসছে না।

২০০০ : রাজশাহীর বাংলা ভাইয়ের বিরুদ্ধেও র‍্যাবের অপারেশন চোখে পড়ছে না।

কর্নেল বারী : আমরা নির্দিষ্ট কাউকে টার্গেট করে কিছু করছি না। আমরা সন্ত্রাস নির্মূলের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। এর সুফল জনগণ পাবে। এ বিষয়ে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।

নেই। কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ ক্ষেত্রে পুলিশ অধ্যাদেশের কথা বলছে। সে ক্ষেত্রে যেকোনো গুলিবর্ষণ ও মৃত্যুর যথাযথ তদন্ত ও দায় নিরূপণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু র‍্যাব সে ধরনের কিছুই অনুসরণ না করায় খুব স্বাভাবিকভাবেই সংবিধান ও আইনের বরখেলাপের প্রশ্ন উঠেছে। অপারেশন ক্লিন হার্ট, র‍্যাব, ক্রসফায়ার সবই এসেছে পুলিশি ব্যবস্থার ব্যর্থতা থেকে।

একই সঙ্গে ক্রসফায়ারে মৃত্যুর বিষয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ও উঠে এসেছে। সরকার ও সরকার সমর্থিত মানবাধিকার সংগঠনগুলো অবশ্য বলছে, সন্ত্রাসীর কোনো মানবাধিকার নেই। তারা যখন হত্যা করে তখন যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন না হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় না। জোট সরকারের মন্ত্রী-নেতারা বিশেষভাবে জোর দিয়ে এই মর্মে কথা বলছেন। সংসদে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, র‍্যাবের ক্রসফায়ার পরিপূর্ণ আইনের আওতায় সংঘটিত হচ্ছে। তবে সব থেকে আগ বাড়িয়ে কথা বলেছেন জামায়াতের নেতা মাওলানা সাঈদী। তিনি চট্টগ্রামের এক ওয়াজ মাহফিলে বলেছেন, সন্ত্রাসীদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। অবশ্য তার দলের সন্ত্রাসীরা র‍্যাবের হাত থেকে নির্বিঘ্নে আছে বলেই সম্ভবত তিনি এ বক্তব্য দিয়েছেন।

মানবাধিকারের প্রশ্নটি খুব বড়ভাবে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আগে তো বেঁচে থাকতে হবে, তারপর তো মানবাধিকার। যদি বেঁচেই না থাকি তাহলে কিসের মানবাধিকার? এ প্রশ্ন র‍্যাবের কার্যক্রম সমর্থন করা সব মানুষের, সাধারণ মানুষের। তাদের বক্তব্য- সন্ত্রাসীদের ধরা হবে, বিচার হবে, তারপর হবে শাস্তি। এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এভাবে তো হচ্ছে না। সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ছে না। ধরা পড়লেও শাস্তি হচ্ছে না। শাস্তির রায় হলেও সেটা কবে কার্যকর হবে, আদৌ হবে কি না, কেউ জানে না। বিচার ঝুলে থাকে, সন্ত্রাসীরা জামিনে থেকে সন্ত্রাস করে পুলিশ তা দেখে না। এভাবে সমাজ থেকে সন্ত্রাস কমছে না। প্রতিদিনই বাড়ছে সন্ত্রাসীর সংখ্যা। যেহেতু আইনগত প্রক্রিয়ায় সন্ত্রাসীদের বিচার করে শাস্তি দেয়া যাচ্ছে না, সেহেতু ক্রসফায়ারে হত্যা করা ছাড়া বিকল্প নেই। র‍্যাব ক্রসফায়ারে হত্যা করে ঠিক কাজই করছে।

বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে এবং জনমনেও র‍্যাবের ক্রসফায়ারে কোনো জামায়াত-শিবির সন্ত্রাসী না পড়ায় প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। জোট সরকারের অপারেশন ক্লিন হার্টেও জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী-ক্যাডাররা রেহাই পেয়ে গিয়েছিল। এবারও র‍্যাবের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে, এ অভিযান জামায়াত-শিবিরের পক্ষপাতদুষ্ট। চট্টগ্রামে র‍্যাবের হাতে বিএনপি-আওয়ামী লীগ নামে পরিচিত সন্ত্রসসীরা ক্রসফায়ারে নিহত হলেও, এমনকি জামায়াত থেকে বিএনপিতে আসা আহমইদ্যাকে হত্যা করা হলেও জামায়াত ক্যাডার ভাগিনা রমজানসহ আরো বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী ক্রসফায়ারে নিহত হয়নি। এই ভাগিনা রমজান র‍্যাবের কাছে যে তথ্য দিয়েছে তাতে জামায়াতের এমপিকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে হয়। কিন্তু চট্টগ্রামসহ দেশের কোথাও র‍্যাব কর্তৃক জামায়াত ক্যাডারদের ক্রসফায়ারের শিকার হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। সব মহলই বলছে, র‍্যাবসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জামায়াতের অনুপ্রবেশ এমন পর্যায়ে যে, র‍্যাবের অপারেশনে তাদের বাদ রাখা হচ্ছে। এ অভিযোগের কোনো যৌক্তিক জবাব নেই র‍্যাবের কাছে। তারা যা বলছে সেটা মানুষ বিশ্বাস করছে না। র‍্যাবের বিরুদ্ধে ওঠা এ অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে আন্ডারওয়ার্ল্ডে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে জামায়াত-শিবিরের। তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ইউনুসের

মতো ভাগ্য বরণ করে নিতে হবে আমাদের প্রগতিশীল লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষকদের। মনে রাখতে হবে, যারা বিএনপি হিসেবে পরিচিত তারাও রেহাই পাবে না জামায়াত-শিবিরের ভয়াল থাবা থেকে। আজকে দেশের মানুষ ভয়ানক সন্ত্রাসের কবলে পড়ে অতিষ্ট হয়ে 'ক্রসফায়ারে' হত্যাকান্ডের মতো ঘটনাকে সমর্থন করছে। যুদ্ধাপরাধী জামায়াত-শিবিরকে প্রতিষ্ঠা করা যদি র‍্যাব ক্রসফায়ারের এজেন্ডা হয় এবং এটা যদি মানুষ বুঝতে পারে তাহলে মনোভাব কী হবে? র‍্যাবের কর্মকান্ডকে সমর্থন করবে?

বিষয়টি ক্ষমতাসীন সরকারের বিশেষ করে বিএনপির গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

র‍্যাবের হাতে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির মোফাক্কর চৌধুরীসহ নেতা-কর্মীদের হত্যার ঘটনায় ঐ দলের প্রতিদ্বন্দ্বী জনযুদ্ধের প্রতি র‍্যাবের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। জনযুদ্ধের বাজেয়াপ্তকৃত পত্রিকায় দেখা যায়, তারাই মোফাক্কর চৌধুরীকে ধরিয়ে দিতে র‍্যাবকে সাহায্য করেছে। জনযুদ্ধের সঙ্গে জোট সরকারের বিশেষ করে তাদের শরিক জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্কের কথা নতুন নয়। খুলনার জামায়াত সাংসদ গোলাম পরওয়ার জনযুদ্ধ গঠনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখেন। এখনো ফুলতলা ডুমুরিয়া অঞ্চলে জনযুদ্ধ সম্পূর্ণই সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। জানা গেছে, এই জনযুদ্ধকে দিয়েই জোট দেশের ১৪টি জেলায় নির্বাচনের আগে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সে কারণে জনযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিটি গ্রুপের বিরুদ্ধে র‍্যাব ও পুলিশের অভিযান তীব্রতর হচ্ছে।

সরকারের বিভিন্ন বাহিনী থেকে সৈনিক অফিসারদের ধার করে এনে গঠন করা হয় র‍্যাব। শুরুতে তাদের পোশাক, অস্ত্র কিছুই ছিল না। এখন র‍্যাবের হাতে আধুনিক অস্ত্র। এসেছে অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্টস। সবকিছু ঠিক থাকলে সামনের সময়টাতে র‍্যাব অপারেশন আরো গতিলাভ করবে।

এখানে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে র‍্যাবকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হবে কি না? আর র‍্যাবের ক্রসফায়ারে সন্ত্রাসীর মৃত্যুবরণ কী আলটিমেট সমাধান? সন্ত্রাসী আহমইদ্যারা নিহত হলেও তাদের গডফাদার শাহজাহান চৌধুরী এমপিরা এখনো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা কী র‍্যাবের আছে?

'অপারেশন ক্লিন হার্ট' চলাকালীন সন্ত্রাসীরা পালিয়েছিল। অপারেশন বন্ধ হওয়ার পর তারা ফিরেও এসেছিল। র‍্যাব যখন থাকবে না তখন সন্ত্রাসীরা কী আবার তাদের কর্মকান্ড শুরু করবে না? যদিও বলা হচ্ছে, র‍্যাব চলে যাওয়ার জন্যে আসেনি। র‍্যাব গঠন করা হয়েছে সব সময়ের জন্যে। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়। পুলিশের মতো আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত একটি পুলিশ বাহিনী থাকলে সন্ত্রাস কমবে কীভাবে? তারাই তো সন্ত্রাসীদের প্রধান শেল্টারদাতা। ব্রাজিল, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই সন্ত্রাস দমনের কাজে বিশেষ বাহিনী দিয়ে সন্ত্রাসীদের হত্যা করা হয়েছে। মাহাথির মোহাম্মদ নিজেও এ কাজ করেছেন। একই কাজ করেছে নকশালদের বিরুদ্ধে ভারতও। এর সুফলও পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে ৭০ দশকে নকশাল দমনের কাহিনি

GLv‡b Avk¼v †`Lv w`‡q‡Q i¨ve‡K ivR‰bwZKfv‡e e¨envi Kiv n‡e wK bv? Avi i¨v‡ei µmdvqv‡i সন্ত্রাসীর gZ¨eiY Kx AvjwU‡gU mgvavb? সন্ত্রাসী AvngB`¨viv wbnZ n‡jI Zv‡`i MWdv`vi kvnRvnvb †PŠaix Ggwciv GL‡bv aiv-‡Qvqvi evB‡i

সবার জানা। এখানে সন্ত্রাসী হত্যার পাশাপাশি তারা পুলিশ বাহিনী সংস্কার করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশে র‍্যাব সন্ত্রাসীদের হত্যা করছে কিন্তু তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক পুলিশ বাহিনী সংস্কার করছে না সরকার। উল্টো পুলিশও চিতা, কোবরা বিভিন্ন নামে অপারেশন শুরু করে সন্ত্রাসী হত্যা শুরু করেছে। এবং তারাও ব্যবহার করছে 'ক্রসফায়ার' শব্দ। এটা কী সন্ত্রাসী হত্যা না 'ক্রসফায়ার' শব্দটিকে অজনপ্রিয় করে তোলার কৌশল সেটাও ভেবে দেখা দরকার কর্তৃপক্ষের।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে র‍্যাবকে ব্যবহার করছে, পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায়ীদের র‍্যাব ব্যাবহারের হুমকি দেয়া হচ্ছে। সবচেয়ে ভয়াবহ কথা বলেছেন মন্ত্রী নামজুল হুদা- সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে র‍্যাব নামানো দরকার। লেখক জাফর ইকবাল আতঙ্কবোধ করেছেন, তিনি একাত্তরকে স্মরণ করেছেন তার লেখায়।

লেখা শুরু করেছিলাম একজন দর্শকের টেলিফোন মন্তব্য দিয়ে। শেষ করবো সাপ্তাহিক ২০০০-এর একজন পাঠকের চিঠি দিয়ে। নীলফামারী আইনজীবী সমিতি থেকে চিঠিটি লিখেছেন আনিসউল হক।

'র‍্যাব' ও 'গডফাদার' বাংলাদেশে এখন সর্বাধিক আলোচিত দুটি বিষয়। সত্তর-আশির দশকে যারা মাসুদ রানার পাঠক ছিলেন এবং যারা জেমস বন্ড পড়েছেন, তারা জানেন যে মাসুদ রানা ও জেমস বন্ড দু'জনই কাউন্টার এসপিওনেজ করতেন। প্রয়োজনে তাদের মানুষ হত্যা করার ক্ষমতাও ছিল। মাসুদ রানার কোড নম্বর হলো এমআর ৯ আর জেমসবন্ডের কোড নম্বর ০০৭। যা তাদের ছিল মানুষ মারার লাইসেন্স। র‍্যাবসদস্যরাও এ ধরনের গোপন ক্ষমতা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েছে কি না জানি না। তবে বাংলাদেশের সুশীল সমাজ যাই বলুন না কেন, সাধারণ মানুষ র‍্যাবের অ্যাকশন সমর্থন করছেন। হতে পারে তা তাদের সাময়িক মানসিক প্রশান্তি। জরিপ চালালেই র‍্যাবের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থনের বিষয়টি বেরিয়ে আসবে।

বাংলাদেশে আজ যারা গডফাদার হিসেবে পরিচিত তারা এই গরিব বাংলাদেশে অকল্পনীয় পরিমাণ বিত্তের মালিক এবং অসীম পরিমাণে ক্ষমতাধর। বাংলাদেশের রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে এখন তাদের ছেলেমেয়েরা স্থান করে নিচ্ছে। এই নতুন প্রজন্মটি দ্রুত বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যোগ্যতাবলেই স্থান করে নিতে যাচ্ছে। এরা প্রায় সবাই উন্নত দেশগুলোতে মানসম্পন্ন পড়াশোনা করে দেশে ফিরেছে ও ফিরছে। এদের বাবা-চাচাদের যে কারণে পিচ্চি হান্নান বা আহমইদ্যা বা এরশাদ শিকদারের প্রয়োজন পড়েছিল, এদের সে প্রয়োজনগুলো নেই। বরং তুখোড় মেধাবী শীর্ষ সন্ত্রাসীরা অচিরেই আমাদের আলোচিত প্রজন্মটির সব কাজেই বাধা হয়ে দেখা দিত। বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের ওপর কাঠামোটিতে সন্ত্রাসনির্ভর সম্পদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আগামী দিনগুলোতে সৃষ্ট এ সম্পদের বৃদ্ধিকরণ ও নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর জন্য অবশ্যম্ভবী হয়ে পড়েছে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ। যে কারণেই শীর্ষ সন্ত্রাসীরা বিদায় নিচ্ছে। আগামীতে বাংলাদেশের রাজনীতির পজিশন-অপজিশন দু'পক্ষই র‍্যাব কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চালু রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের 'গডফাদার'গণ সুশীল হোক এ শতাব্দীতে- এই আমাদের কামনা।'

আমাদের সমাজের যারা ধারক-বাহক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যারা নিজেদের দাবি করেন তারা সাধারণ জনমানুষের নার্ভ বুঝতে পারেন না। এখন কেন মানুষ র‍্যাবকে সমর্থন করছে তারা সেটা না বুঝে, অনুধাবন না করে আরো বেশি নিরবচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। পাঠকের মন্তব্য এবং এই চিঠি সেটাই প্রমাণ করছে। চিঠিটিতে আশার কথা বলা হয়েছে। আমরা নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছি আশার কথাটা দিয়েই।